কেওক্রাডং অভিযানের প্রতিবেদন ২০১৬

পিকের নামঃ কেওক্রাডং

রেঞ্জঃ পলিতাই

উচ্চতাঃ ৯৯২ মিটার (৩২৫৪.৫৯ ফিট)

কো-অর্ডিনেটসঃ Latitude: N 21° 56′ 59.93″ , Longitude: E 92° 30′ 52.14″

তারিখঃ ২৩/০৩/২০১৬ থেকে ২৬/০৩/২০১৬

আয়োজকঃ ট্রাভেলার্স অব বাংলাদেশ

লোকেশনঃ রুমা উপজেলা, বান্দরবান, বাংলাদেশ।

জিপিএস ডিভাইসঃ জারমিন ই-ট্রেক্স ২০

একটিভিটি টাইপঃ ট্রেকিং

এক্সপিডিশনঃ কেওক্রাডং

রিপোর্ট লিখনঃ নীরব মাহমুদ

লেখকের যোগাযোগ তথ্যঃ Email: nmahmudcp@gmail.com, Website: http://blog.codespuzzle.com

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
০১	প্রারম্ভিকা	০৩
০২	আমার অহেতুক কৈফিয়ত ও উঁকি দিয়ে আকাশ দেখার স্বপ্নের শুরু	”
০৩	ঘুমচোখে পাহাড়ের কার্ণিশে কুয়াশার খোঁজ	০৫
০৪	রুমা বাসষ্ট্যান্ডের ২ আগন্তুক	”
০৫	সদরঘাটে সাঙ্গুকে প্রথম দেখার মুহূর্ত	০৬
০৬	রোদজ্বলা রাস্তায় পাহাড়ি বুনোফুল	”
০৭	একজন হাস্যোজ্জল গাইড এবং একজন বিষন্ণ আলপাইনিষ্ট	০৭
০৮	রুমা মন্দিরের গেরুয়া রং এবং প্রথম আর্মি ক্যাম্প হাজিরা	”
৯	কমলাবাগানের ছাউনি থেকে আকাশের পথে	০৮
১০	আহ সুপ্রিয় বগাকাইন!	০৯
১১	সিয়ামদির কটেজ, জ্যোৎস্নাহত রাত এবং চায়ের কাপে আড্ডা	১০
১২	১৬০০ ফিটের উপর থেকে শুভ সকাল!	১১
১৩	রুংতং থেকে কেওক্রাডং	”
১৪	সামিট	”
১৫	জুমের আগুনে বিকেল নামে নির্জন ট্রেইলে	১২
১৬	জলপাই রংয়ের তীব্র ঝাঁজ ও আমাদের পূর্ণিমাযাপন	১৩
১৭	ফেরতযাত্রায় শহুরে সৌখিন পর্বতারোহী	”
১৮	কেওক্রাডং ম্যাপ	১৪ - ১৬
১৯	খরচের বিস্তারিত	১৭
২০	টিম মেম্বার ও তাদের দায়িত্ব	”
২১	এক্সপিডিশনের ছবি লগ	১৮ – ২০
২২	পরিশিষ্ট	২১

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশের বহুল পরিচিত এবং জনপ্রিয় পর্বতচূড়ার নাম কেওক্রাডং। কেওক্রাডং বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত। যা বাংলাদেশের পঞ্চম উচ্চতম পর্বত। এর উচ্চতা ৯৯২ মিটার (৩২৫৪.৫৯ ফুট প্রায়, নিজস্ব জি পি এস রিডিং হতে প্রাপ্ত) । কেওক্রাডং শব্দটির উৎপত্তি মারমা ভাষা থেকে । মারমা ভাষায় কেও মানে 'পাথর' ক্রা মানে 'পাহাড়' আর এবং ডং মানে 'সবচেয়ে উঁচু'। অর্থাৎ কেওক্রাডং মানে সবচেয়ে উঁচু পাথরের পাহাড়।

একসময় যখন একে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মনে করা হতো তখন এর উচ্চতা পরিমাপ করা হয়েছিল ১,২৩০ মিটার। কিন্তু অধুনা রাশিয়া কর্তৃক পরিচালিত এসআরটিএম উপাত্ত এবং জিপিএস গণনা থেকে দেখা গেছে এর উচ্চতা ১,০০০ মিটারের বেশি নয়। শৃঙ্গের শীর্ষে সেনাবাহিনী কর্তৃক উৎকীর্ণ যে ফলক দেখা যায় তাতে এর উচ্চতা লেখা হয়েছে ৩,১৭২ ফুট। আমাদের নিজস্ব জিপিএস সমীক্ষায় উচ্চতা পাওয়া গেছে ৯৯২ মিটার (৩২৫৪.৫৯ ফুট)। এই পরিমাপটি সোভিয়েত পরিমাপের সাথে খাপ খায়। এসআরটিএম উপাত্ত এবং মানচিত্রের মাধ্যমে এই পরিমাপ করা হয়েছে।

আমার অহেতুক কৈফিয়ত ও উঁকি দিয়ে আকাশ দেখার স্বপ্নের শুরু

শৈশবে চিটাগাং ফায়ার সার্ভিসের কোয়ার্টারে থাকতাম তখন। কোয়ার্টার বিল্ডিংয়ের পাশে সুউচ্চ একটি টিলা ছিলো। প্রতিদিন বিকেলে আমরা ক'জন তখন সামিট করতাম! সামিট শব্দটাও তখন শুনি নি। কিন্তু, সবকিছু ছাড়িয়ে উচ্চতায় বসে নিজের পরিচিত চারপাশকে দেখতে বড়ো ভালো লাগতো। মনে হতো পাখির চোখে দেখছি আমার প্রাত্যহিক সংসার।

আমার তথৈবচ শৈশব এবং টলমলে কৈশোরের দিনগুলোতে সবসময়ের সঙ্গী ছিলো রাশিরাশি বই। সমরেশের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি তখন জলপাইগুড়ি আর ডুয়ার্সের পাহাড়ে পাহাড়ে। এরই মধ্যে পড়া হয়ে গেলো চাঁদের পাহাড়। অদ্ভূত এক ঝিমধরানো নেশায় বুঁদ হয়ে রইলাম কিছুদিন। তারপর বেঁচে থাকার দৈনন্দিন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পুরি, রুটি আর রেডিমেড ছোট্ট দই কিংবা তন্দুর থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া বাকরখানিতে কেটে যাচ্ছে দিন। তখনকার সময় বহুদিন পাহাড়ের খোঁজ নেয়া হয় নি।

তারপর, ফেসবুকে বিচরণ শুরু করলাম। পড়ার টেবিলে হাজির হলো স্যার হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড। মন্টেজুমা'স ডটার, দি পিপ্‌ল অফ দ্য মিস্ট, দ্য হলি ফ্লাওয়ার, কুইন শেবা'স রিং , বইগুলো সস্তার নিউজপ্রিন্টের পৃষ্ঠার প্রতিটি লাইনে আটকে থাকা নায়কেরা আমাকে পাহাড়ের পর পাহাড় পার করে নিয়ে যেতো হাজারো বছরের পূর্বেকার সময়ে। যেখানে আমি না থেকেও ছিলাম। হয়তো কোন পাহাড়ি গোত্রের সর্দার হয়ে। কিংবা, আমার আকাক্ষিত পাহাড়ি শামান হয়ে।

ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম টিওবির সাথে। দেখতে থাকলাম। পড়তে থাকলাম। লোকাল হিরোদের পাহাড় দাঁপিয়ে বেড়ানোর গল্প খুঁজে বের করতাম। সামুতে পড়ে থাকতাম। ট্রেকিং, ট্রেইল, সামিট, জিপিএস, হাইকিং, ট্রেভাস ইত্যাদি নতুন শব্দের ভান্ডার যোগ হতে থাকলো। সময় গড়ালো। বাড়লো পড়াশোনার পরিধি। লোকাল হিরোদের সাথে যুক্ত হলেন বৈশ্বিক ফ্লেভার। শুরু করলাম সাইক্লিং। নতুন জগতে সেইসব পাহাড়ের মানুষদের সাথেই দেখা হয়ে যেতে থাকলো।

জানলাম তেনজিং, হিলারী, মেসনার, ভিশ্চার্স, স্কট ফিশার, বুক্রেভসহ আরো অসংখ্য রূপকথার মানুষদের। চাঁদের পাহাড়ের সেই অভিযাত্রীর কথা আবার এসে হাজির হলো মনের আঙিনায়। আট হাজারী পর্বত, এভালেঞ্জ, ক্যারাবিনার, ক্রাম্পন, বেসক্যাম্প , ফিগার অফ এইট ইত্যকার নতুন শব্দ ভরে দিচ্ছিলো আমার ভান্ডার। অজান্তেই আবারো ভালোবাসতে শুরু করেছি পাহাড়কে। চাঁদের পাহাড় আবার ফিরে এসেছে আমার মাথার ভেতর। মনে হচ্ছে, পাহাড়ি ট্রেইলের সোঁদা মাটির ঘ্রাণ পাচ্ছি আমি..। আমি এবার যেতে চাই দূর পাহাড়ের পথে..।

পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে মেঘ ছুঁয়ে দেখার অনুভূতি আমি জানতে চাই। বারবার ব্যর্থতার পরও কেনো একজন অভিযাত্রী আবার ফিরে আসেন এই দুর্গম পাহাড়ে, আমি বুঝতে চাই। আমি শুনতে চাই পাহাড়ের আবিষ্ট নীরবতার ভাঁজে ভাঁজে আটকে থাকা জীবনের অপার্থিব সুর। যে নেশা সারা পৃথিবীর সব পর্বতারোহীকে বারবার টেনে আনে মৃত্যু আর জীবনের এই সীমানায়। যে নেশায় সজল ভাইয়েরা হারিয়ে গেছেন। মুগ্ধ ভাইয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছেন পাহাড়ের ভালোবাসা নিয়ে..।

অসংখ্য বছর ধরে অটল দাঁড়িয়ে থাকা ছোটবেলায় শোনা কবিতার মতো মৌন মহান এই পাহাড়কে আমি ভালোবাসতে চাই। আমি চাই, পাহাড় আমাকে আরোহনের অনুমতি দিক। প্রিয় বন্ধুর মতো এই যন্ত্রনার নাগরিক সময়ে আমাকে আগলে রাখুক। আমি ভরপেট খেয়ে নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চাই পাহাড়ের কার্ণিশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোন এক জুমঘরে। ছোটবেলার মতো আমি দেখতে চাই আমার চারপাশকে পাখির চোখে..।

সেজন্যই এবার যাত্রার পথ পাহাড়ের দিকে।

ঘুমচোখে পাহাড়ের কার্ণিশে কুয়াশার খোঁজ

টিওবির একটি ইভেন্ট ঘোষণা দেখে আমি আমার নতুন পথের যাত্রায় শামিল হবার কথা ভাবতে শুরু করলাম। প্রথমে কেনো ট্রেকিংয়ে আগ্রহী সেটা লিখে জানালাম। তারপর টিম মিটিং, নানা আলোচনা, ম্যাপ নিয়ে ঘাটাঘাটি, ব্যাকপ্যাক রেডি করে আমরা ১২ জন উঠে বসেছি ইউনিক সার্ভিসের চকচকে নতুন বাসে, বান্দরবানের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের খেলা শুনতে শুনতে রাতের শহর পেরিয়ে আমরা খোলা হাইওয়েতে পড়লাম। ছুটে চলেছে আমাদের বোরাক..। আমার চোখে এবং ভাবনায় ছবিতে দেখা বান্দরবানের ছবি ভাসে। কুমিল্লায় বিরতি শেষ কখন ঘুমিয়েছি, জানি না। সকালে ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে বাইরে দেখি। পাহাড়ের সর্পিল উঁচুনিচু পথে আমাদের বাস চলছে। ভোরের হালকা কুয়াশার আস্তরণ আটকে আছে পাহাড়ের কার্ণিশে। কী দারুন ঝকঝকে একটি ভোর!

সকাল বাড়তেই নামার সময় হলো। বিলাসবহুল হোটেলের নীচে রেস্তোরায় জম্পেশ নাস্তা শেষে অটোতে চলে আসলাম রুমা বাসষ্ট্যান্ডে। পাহাড়ের পাদদেশে রুমা বাসষ্ট্যান্ডের অবস্থান। সকালের সূর্যি আমাদের স্বাগত জানায় একটু পর। কলাগাছের কোমল পাতায় পিছলে পড়ে আলোকের ঝর্ণাধারা। আমার মনে হয়, আমার ক্লান্তির অবশেষটুকুও জুড়িয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে..। বাসষ্ট্যান্ডের উল্টোদিকে রাস্তা পেরিয়ে ছবির মতো একটি চায়ের দোকান। বাস আসতে আরো ঘন্টাখানেক। সিট না পেয়ে পরের বাসে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ায় অপেক্ষার সময়টা আরেকটু দীর্ঘ হয়েছে।

রুমা বাসষ্ট্যান্ডের ২ আগন্তুক

আমরা বসে আাছি। এমন সময় প্রমাণসাইজের বেশ বড়ো আকারের ব্যাকপ্যাক এবং ক্যামেরা গিয়ার্স সমেত একজন নামলেন রুমা বাসষ্ট্যান্ডে। সালেহীন ভাই তাকে দেখে বেশ পরিচিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। কুশল বিনিময় শেষে নিয়ে এলেন চায়ের দোকানে। পরিচয় জানলাম, রেঞ্জার সাগর উনার নাম। অসংখ্যবার এসেছেন বগালেক আর বান্দরবানে। শুনে চমৎকৃত হয়েছি। আমরা আমাদের হাবিজাবি নানা টপিক নিয়ে কথা বলছি। সালেহীন ভাই কথা বলছিলেন সাগর ভাইয়ের সাথে।

আমি তাকিয়ে ভাবছিলাম, পাহাড়ে উনি কেনো বারবার ফিরে আসেন? কতোটা পাহাড় উনাকে টেনে আনে? নাকি, ব্যবসা কিংবা অন্যকিছু?

একটু পর সালেহীন আমাদের সাথে আরেকজন আগন্তুকের পরিচয় করিয়ে দেন। নাম শান্তনু। লম্বা এবং টিঙটিঙে ভদ্রলোককে খুব চেনা লাগছিলো আমার। উনার এই পরিচিত ভাবটা আমাকে কিছুটা আগ্রহী করে রেখেছিলো।

শহর থেকে বহুদূরের এই কর্ণারে দাঁড়িয়েও যখন পরিচিত মানুষদের দেখা মিলে যায়, তখন আমি কিছুটা ভাবুক হয়ে উঠি। ভাবি, কোথাও হারাবার জায়গা কি আসলেই নেই? নিজের জন্য সময় বের করে একটু নির্ভার থাকার জায়গা আসলে কোথায়?

সদরঘাটে সাঙ্গুকে প্রথম দেখার মুহূর্ত

ইত্যবসরে বাস চলে আসে আমাদের। ছোটছোট আসনের বাসে সবাই ব্যাগ-প্যাটরা সমেত উঠে বসি। অসংখ্য পাহাড়ি বাঁক, সুদূর পাহাড়ের কোলে পাহাড়ি পাড়া, দিগন্তের পর্বতের সারি, উঁচুনিচু পথ ধরে একসময় আমরা পৌঁছে যায় রুমা সদরঘাটে। এখান থেকে রুমা বাজারে যেতে হবে। বাস থামার একটু আগে জানালা দিয়ে দেখি সাঙ্গু নদী। পড়ন্ত দুপুরের হালকা সোনালি রোদ নদীর পানিতে চিকচিক করছে। ছোটছোট নৌকো বাঁধা পাড়ে। নদীর একপাশ ঘেষে সটান উঠে গেছে পাহাড়।

বাস থেকে নেমে লাল-সাদা রেলিয়ের ব্রিজের ব্যাকগ্রাউন্ডে দাঁড়ানো পাহারের অবয়ব এবং কিছুসময় আগের সাঙ্গু নদীর প্রথম দেখার অনুভব সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। একটি ছবির উপর অন্যছবির ওভারল্যাপড হবার রোমান্টিক মুহূর্তেও আমার পিপাসা পায়। নির্ভেজাল জলের তৃষ্ণা!

রোদজ্বলা রাস্তায় পাহাড়ি বুনোফুল

বাস থেকে নেমে রুমা বাজারে যাবার জন্য চান্দের গাড়ির খোঁজ করি। চান্দের গাড়ি এক আজব ধরণের যান। ফোরহুইল ড্রাইভের এই জিপ শেপের গাড়িগুলো বান্দরবানসহ বাংলাদশের পার্বত্য জেলার অনন্য যাতায়াতের মাধ্যম। ধনুকের মতো খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে কী দারুন সাবলিলতায় চলতে থাকে, না দেখলে বিশ্বাসই হতে চাইবে না। এই চান্দের গাড়ির চমৎকৃত হওয়ার ব্যাপারটা আমি আরো পরে জানতে পারবো। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, আমাদের হেঁটে যাওয়াতেই সাশ্রয় হবে। একই সাথে প্রাথমিক হাঁটার মধ্য দিয়ে জার্ণির জড়তাও কাটবে খানিকটা। তাই, রুমা সদরঘাট থেকে রুমা বাজারের দিকে হাঁটতে শুরু করি আমরা। র্সূয তখন মধ্য আকাশ থেকে একটু নেমে দাঁড়িয়েছে। তারপরও রোদের তীব্রতা মোটামুটি দারুন রকমের।

আমরা হাঁটছি দুলকি চালে। ব্যস্ততাহীন সহজ পথ চলা। কেউ সাইডপ্যাক থেকে পানির বোতলে চুমুক দিচ্ছেন। কারো মনে হচ্ছে, ব্যাকপ্যাকটা আরেকটু হালকা হলে বোধহয় ভালো ছিলো। আমি হঠাৎ দেখা পেলাম পাহাড়ি

বুনোফুলের। রাস্তার পাশে ফুটে আছে উজ্জ্বল হয়ে। বিকেলের সোনালী রোদের কনেদেখা আলোতে চমৎকার লাগছিলো সবুজ পাতা আর হালকা গোলাপীর মিশ্রণ।

বান্দরবানে আমাকে যেনো বরণ করে নিচ্ছিলো প্রকৃতি। বড়োরা বলেন, পাহাড় নাকি তার প্রিয়জনদের বর দেয়। আমার জন্য বর ছিলো কিনা জানি না। তবে সেই রোদজ্বলা রাস্তার পাহাড়ি ফুলগুলো দেখার অকারণ শান্তির মুহূর্তটা আমার ব্যাখার অতীত।

একজন হাস্যোজ্জল গাইড এবং একজন বিষন্ণ আলপাইনিষ্ট

আনুমানিক আধাঘন্টার হাঁটাপথ শেষে আমরা এসে পৌঁচেছি রুমা বাজারে। এখান থেকে গাইড নিয়ে সামনে এগুতে হবে আমাদের। বাজারের মুখেই স্কুল, ছুটি হয়েছে তখন। চীবর পরিহিত বৌদ্ধ কিশোরগুলোকে অন্যরকম লাগছিলো। মোটামুটি জমজমাট বাজার। মার্কেটিং চেইনের কল্যাণে হাল আমলের প্রসাধনী থেকে শুরু করে সব ধরণের পণ্যই দেখলাম দোকানগুলোতে। এখানে আমি প্রথম দেখি, সালেহীন ভাইদের পূর্ব পরিচিত গাইড নিউটনকে। প্রথম দেখার মুহূর্তটিতে নিউটন প্রাণখুলে হাসছিলো। ঝলমলে হাসিতে উদ্ভাসিত মুখটি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, মনের গভীরে নিশ্চল শান্ত শান্তির আধার থাকলেই কেবল এতো সহজ হাসি সম্ভব হয়। হয়তো ও জানেই না আলাদা করে, শান্তি কাকে বলে! কিংবা, শহুরে আমাদের কাছে স্বস্তিতে হাসতে পারা কতোটা অমূল্য! কথার ফাঁকে ফাঁকে হাসছিলো। পুরো যাত্রায় নিউটন আমাদের সঙ্গ দিয়েছে এই ট্রেডমার্ক হাসিমুখ নিয়ে।

ঠিক একইসময়ে আমাদের একজনকে আমি দেখেছি ধীরে ধীরে বিষন্ণ হয়ে উঠতে। সালেহীন ভাইকে আমি হাসিখুশি, অন্যমনস্ক এবং ভাবুক মানুষ হিসেবে চিনি। কিন্তু, সেদিন থেকে উনার আরেকটা ভিন্নরূপ আমার সামনে উঠে আসছিলো। যতোই আমরা বান্দরবানের ভেতরদিকে যাচ্ছিলাম, ক্রমশঃ যেনো তিনি বিষন্ণ হয়ে উঠছিলেন। এই সফরের বেশিরবাগ সময়ই আমার কাছে উনাকে অন্যমনষ্কই মনে হয়েছে। জানি না কেনো..। আমার অহেতুক ভাবনারা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। মনে হয়, জীবন কতো অদ্ভূত! একই সাথে একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষ এবং একজন বিষন্ণ পাহাড়প্রেমীর পথ বেঁধে দিয়েছে..।

রুমা মন্দিরের গেরুয়া রং এবং প্রথম আর্মি ক্যাম্প হাজিরা

রুমা বাজার গাইড সমিতি থেকে ১০০ টাকায় কেনা এক পৃষ্ঠার দাগটানা কাগজে আমাদের প্রয়োজনীয় নাম ঠিকানা লেখা শেষ হতেই আমরা হাজির হলাম রুমা বাজার আর্মি ক্যাম্পে। এর আগে নাম-ঠিকানার কাগজটির সম্ভবত ৫/৬ টি ফটোকপি করে নেয়া হয়েছে। সামনের আরো ক্যাম্পে দরকার হবে। বাধ্যতামূলক নিয়ম হচ্ছে শহরে ঢুকতে এবং বের হতে গেলে আর্মি ক্যাম্পে এন্ট্রি করাতে হবে। আর্মি ক্যাম্পের হাজিরার বিষয়টির সাথে এবারই আমার প্রথম পরিচয়। রুমা আর্মি ক্যাম্প একটি টিলার উপরে। টিলার পাশে মাথা তুলেছে গেরুয়া রঙের মন্দিরের চূড়ো।

আর্মি ক্যাম্পের বৈরী দৃষ্টির সৈনিকের বিরক্তিকর মুখ আর অন্যদিকে দূর পাহাড়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা শতবছরের পুরোণো ওম প্রতীক চিহ্নিত মন্দিরের শীর্ষদেশ, একসাথে মিলে অদ্ভূত ফ্রেম সৃষ্টি হয়েছে। একজনের হাতের কাছে অস্ত্র, অন্যদিকে 'ওম' সৃষ্টি ও শান্তির বার্তা..। ক্লান্ত রোদ ঢলে পড়ছে পাহাড়ের মাথা থেকে। ক্লান্ত আমরা বসে দেখছি একঘেয়ে ফরম পূরণের আনুষ্ঠানিকতা। ভাবছিলাম, এই জায়গায় যেদিন প্রথম মানুষের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়, সেসময়টিও হয়তো এমন পড়ন্ত দুপুর ছিলো? সেই মানুষটির মনের অবস্থা কেমন ছিলো তখন? তখন কি শুধু আবিষ্কারের আশায় তিনি এখানে এসেছিলেন? নাকি বাসস্থানের প্রয়োজন মেটাতে এসেছিলেন সাঙ্গুর দেখানো পথ ধরে?

কমলাবাগানের ছাউনি থেকে আকাশের পথে

রুমা বাজার থেকে চান্দের গাড়িতে করে ভয়ধরানো উঁচুনিচু চড়াই-উৎড়াই পার হয়ে বগালেগের নীচের পাড়া কমলাবাগানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়েছে আমাদের। পথে আরেকটি পুলিশ চেকপোষ্টে এন্ট্রি করতে হয়েছে। পথ এখানে চরম বন্ধুর। কখনো সোজা ওঠে যাচ্ছে আসমানে। আবার তারপরই নেমে যাচ্ছে জমিনে..। ভাঙা উথাল-পাথাল বাঁক, ভীষন ঝাঁকিতে বেসামাল আমাদের নিয়ে উড়ে চলেছে চান্দের গাড়ি। চলতে চলতে সাগর ভাইয়ের অভিজ্ঞতার বয়ান শুনছি।

নিজের ভাবনা, গল্প, ঝাঁকির রেশ সব মিলে একসময় পৌঁছে গেলাম বগালেকের নীচের উপত্যকা কমলাবাগানে। গাড়ি থামার জায়গাতেই ৩/৪ টি দোকান। অনাড়ম্বরপূর্ণ হলেও আন্তরিকতার কমতি নেই দোকান মালিকদের। কোন কিছু সওদা না করেও আমরা বিশ্রাম নিই সেখানে।

তারপর এবার খাড়া ঢাল বেয়ে উপরে চড়ার শুরু। পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে আঁকাবাঁকা পথ। মাথা ছুঁয়েছে আকাশ। পিঠে ব্যাগ নিয়ে উঠতে গিয়ে একটু পরই হাঁফ ধরে যায়। মনে হয়, নাহ! আমি আর পারবো না। মাঝরাস্তায় গিয়ে দেখি, সহযাত্রী একজন ব্যাগ নিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। সাহস করে শুরু করলাম লোড ফেরী।

আমার ব্যাকপ্যাকের প্রায় ৩ গুণ ওজনের বাড়তি বোঝা নিয়ে উপরে উঠতে থাকলাম ধীরে ধীরে। সঙ্গ দিলো বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো, বাসা থেকে আনা সাধারণ মানের খেঁজুর আর পানি। একসময় শেষ হলে আকাশের পথে চড়ার যাত্রা।

আহ সুপ্রিয় বগাকাইন!

পাহাড়ের চড়াই শেষ করতেই দারুণ একটি ওয়াইড এ্যাঙ্গেল সিনেরিও আমার সব ক্লান্তিকে নিমিষে থামিয়ে দেয়। এতো উচ্চতায় আমার সামনে মোলায়েম কোমলতা নিয়ে শুয়ে আছে কিংবদন্তির বগকাইন হ্রদ। সবার পরিচিত বগালেক। বগাকাইন হ্রদ বা বগা হ্রদ বা বগা লেক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার স্বাদু পানির একটি হ্রদ। বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে বগাকাইন হ্রদের অবস্থান কেওক্রাডং পর্বতের গা ঘেঁষে , রুমা উপজেলায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১২০০ ফিট (কেওক্রাডং-এর উচ্চতা ৩২৫৪.৫৯ ফিট) রুমা উপজেলার পূর্ব দিকে সাঙ্গু নদীর তীর থেকে ২৯ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি মৌজার নাম 'নাইতং মৌজা'। এই মৌজার পলিতাই পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত একটি পাহাড়ের চূড়ায় বগাকাইন হ্রদ অবস্থিত।

বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিকগণের মতে বগাকাইন হ্রদ মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ কিংবা মহাশূন্য থেকে উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে আবার ভূমিধ্বসের কারণেও এটি সৃষ্টি হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটি ভুবন স্তরসমষ্টির (Bhuban Foundation) নরম শিলা দ্বারা গঠিত। বাংলাপিডিয়ায়এর পানি বেশ অম্লধর্মী এবং একারণে এতে কোনো শ্যাওলা বা অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ নেই , এবং কোনো জলজ প্রাণীও এখানে বাঁচতে পারেনা বলা হলেও ২০০৯-এর তথ্যসূত্রে জানা যায় বগা লেকের পানি অত্যন্ত সুপেয়, এবং লেকের জলে প্রচুর শ্যাওলা, শালুক, শাপলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ এবং প্রচুর মাছ এমনকি বিশালাকার মাছ রয়েছে।

বগালেকের পাশে একটি বম পাড়া (বগামুখপাড়া) এবং একটি মুরং পাড়া আছে। স্থানীয় আদিবাসীরা বম, মুরং বা ম্রো, তঞ্চংগ্যা এবং ত্রিপুরাসহ অন্যান্য আদিবাসী। স্থানীয় আদিবাসীদের উপকথা অনুযায়ী , অনেক কাল আগে পাহাড়ের গুহায় একটি ড্রাগন বাস করতো। বম ভাষায় ড্রাগনকে *"বগা"* বলা হয়। ড্রাগন-দেবতাকে তুষ্ট করতে স্থানীয়রা গবাদী পশু উৎসর্গ করতেন। কিন্তু একবার কয়েকজন এই ড্রাগন দেবতাকে হত্যা করলে চূঁড়াটি জলমগ্ন লেকে পরিণত হয় এবং গ্রামগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। যদিও এই উপকথার কোনো বাস্তব প্রমাণ নেই , তবুও উপকথার আগুন উদগীরণকারী ড্রাগন বা বগা এবং হ্রদের জ্বালামুখের মতো গঠন মৃত আগ্নেয়গিরির ধারণাটির সাথে মিলে যায়।

এই হ্রদটি তিনদিক থেকে পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত। এই শৃঙ্গগুলো আবার সর্বোচ্চ ৪৬ মিটার উঁচু বাঁশঝাড়ে আবৃত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৫৭ মিটার ও ৬১০ মিটার উচ্চতার মধ্যবর্তী অবস্থানের একটি মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হচ্ছে ৩৮ মিটার (১২৫ ফুট)। এটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ হ্রদ — এ থেকে পানি বের হতে পারে না এবং কোনো পানি ঢুকতেও পারে না। এর আশেপাশে পানির কোনো দৃশ্যমান উৎসও নেই। তবে হ্রদ যে উচ্চতায় অবস্থিত তা থেকে ১৫৩ মিটার নিচে একটি ছোট ঝর্ণার উৎস আছে যা *বগা ছড়া* নামে পরিচিত। হ্রদের পানি কখনও পরিষ্কার আবার কখনওবা ঘোলাটে হয়ে যায়। কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন এর তলদেশে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে। এই প্রস্রবণ থেকে পানি বের হওয়ার সময় হ্রদের পানির রঙ বদলে যায়।

সিয়ামদির কটেজ, জ্যোৎস্নাহত রাত এবং চায়ের কাপে আড্ডা

বগালেক দেখার পর আমাদের প্রথম কাজ ছিলো আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করা। কাজ শেষ করে আমরা এগিয়ে গেলাম বগামুখ পাড়ার দিকে। বম অধ্যুষিত এই পাড়াতেই আমাদের রাতে থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে। কটেজ মালিক সিয়ামদি' রীতিমতো বিখ্যাত মানুষ। আমাদের গাইড নিউটন এবং সালেহীন ভাইয়ের ঘনিষ্টতার সূত্রে আমরা বিশেষ খাতির পাই। নিজেদের ডেরায় ব্যাগব্যাগেজ রাখতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। শেষ বিকেলে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম বগাকাইনের হিমশীতল জলে।

আহ! শান্তি! পরিপূর্ণ একটি গোসল আমাদের ক্লান্তি দূর করে দিলে আমরা গিয়ে বসি সিয়ামদি'র কটেজের আঙিনায়, চান্দিনা ঢাকা জায়গাতে। জেনারেটরের আলোয় সিয়ামদির'র দোকান এবং বাসা সব আলোকিত। বাইরে আকাশ ভেঙে জ্যোৎস্না নামছে চরাচর জুড়ে। এতো উচ্চতায় এই প্রথম আমার জ্যোৎস্না দেখা..।

একটু পর খাবার এলো। ভাত, আলুভর্তা, ডিমভাজি, সবজি এবং সাথে মরিচ ও পেয়াজের কুচিয়ে ভর্তা। দারুন! সারাদিনের চলার শেষে প্রিয় মেন্যু পেলে আর কী লাগে! অন্যদের কেমন লেগেছে, জানি না। তবে, আমার কাছে বেশ তৃপ্তিকর ছিলো। খাওয়া শেষ করে আমরা কেউ কেউ চা নিলাম। কেউ সিগারেটের ধোঁয়া। টুকটাক আড্ডা গল্পে কেটে গেলো অনেকটা সময়..। নিজেদের মাচাংয়ে এসে তারপর আরেকপ্রস্থ গল্প, সালেহীন ভাইয়ের র্যা পলিং, ক্লাইম্বিং টিপস, নট শেখানো সেই সাথে সন্দ্বীপের ডেমোনেষ্ট্রশন..। সবশেষে রাতের জন্য ঘুমের বিরতি..। আলো নিভে যাওয়ার পর ভেসে আসছিলো দূর থেকে প্রার্থনার সম্মিলিত গান। হাজার বছরের পুরোনো এই রাতে বগাকাইনের পাশের পাড়ায় শুয়ে আছি আমি এক নব্য ইবনে বতুতা..। অপেক্ষা করছি ঘুমের..।

১৬০০ ফিটের উপর থেকে শুভ সকাল!

রাতে ভরপুর তৃপ্তিকর ঘুমের শেষে সকালে উঠেই মনে হলো, এতোটা উচ্চতায় আমার এই প্রথম ভোর। মিহি কুয়াশার আস্তরন এখনো রয়ে গেছে চারপাশে। সকালটা সত্যিকার অর্থেই দারুন লাগছিলো। বগাকাইনের পানির উপরে ভেসে বেড়াচ্ছিলো আকারহীন কুয়াশার মেঘ। সিয়ামদির কটেজের সামনের খোলা জায়গাতে কিছু কুকুর জটলা পাকাচ্ছে। বগামুখপাড়া তখন শান্ত নীরব। সিয়ামদি আমাদের সকালের নাস্তার জোগাড়যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত..। হাতমুখ ধুয়ে শান্তিতে বসলাম আঙিনায়..। যান্ত্রিক কোলাহলহীন শান্ত সুন্দর এই সকালটাতেই যদি সময় থমকে যেতো...।

রুংতং থেকে কেওক্রাডং

ভোরে উঠেই আমাদের তৈরী হয়ে নেয়ার কথা ছিলো। সে অনুসারে আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে নিচ্ছিলাম। সামনে লম্বা সময়ের ট্রেক। আজকেই আমাদের কেওক্রাডংয়ের পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। শেষ বিকেলে ফিরবো আমার বগামুখপাড়ায়। পানির বোতল, শুকনো খাবার, ক্যামেরা, জিপিএস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামান গুছিয়ে নিচ্ছি যার যার ব্যাকপ্যাক , র্যা কসাকে। সিয়ামদির ওখানে খিচুড়ি আর ঝাল মরিচের কুচি দিয়ে পেট ভর্তি করে নিয়ে আমরা তৈরী হলাম। কারো হাতে পথ চলার সঙ্গী হিসেবে রয়েছে চিকন বাঁশের ছড়ি। সবাই বের হয়ে গ্রুপছবি তুললাম। ততোক্ষণে সূর্যদেব উঠে এসেছেন মাথার উপর। কঠিন একটা দিনের শুরুর ঘোষণা দিচ্ছে। শুরু হলো আমাদের কেওক্রাডং যাত্রা। নিজের স্বপ্নের পথে যাত্রা..। বগামুখ পাড়ার শেষ থেকে পাহাড়ি ট্রেইলের শুরু হলো। যে পাহাড়ের বেল্টে আমরা উঠলাম, তার নাম রুংতং।

সামিট

দার্জিলিং পাড়া থেকে দূরে দেখা যাচ্ছিলো কেওক্রাডং। আকাশের ঝুলন্ত একটি অংশ বলে ভ্রম হয়। দার্জিলিং পাড়ায় ঢুকতেই দেখলাম ট্রেইলের পাশে ২ টি এপিটাফ। স্বামী এবং স্ত্রীর সমাধি। কারা ছিলো এরা? জীবনের চলার সময়টুকুতে দূরে দাঁড়ানো কেওক্রাডং তাদের জীবনকে কি কখনো প্রভাবিত করেছে?

গির্জায় প্রার্থনা চলছিলো। ইষ্টার সানডের প্রস্তুতি । মাইকে সুর করে প্রার্থনা সঙ্গীতের শব্দ ভাসছিলো। ক্ষনিকের বিশ্রাম শেষ করে আমরা বের হলাম আমাদের শেষ গন্তব্যের পানে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছি উপরের দিকে। ক্রমশঃ

কঠিন হয়ে আসছে চড়াই। একেকটা ধাপ পার হলে পরের ধাপ এসে হাজির হয় সামনে। সময়ের জ্ঞান নেই। স্বপ্নপূরণের কাছে আসার আবেগ, প্রত্যাশার চাপ, পূর্ণতার অনুভূতি সবমিলে মাথা কাজ করছিলো না। বোতলের পানির শেষ বিন্দুটুকু শেষ হয়েছে বহুক্ষণ। একটা ধাপে এসে দূর থেকে দেখা যাচ্ছিলো সামিটের স্থান।

শেষ এই ধাপটি শেষ হতেই চাইছিলো না। ক্লান্তিতে নুয়ে আসছে শরীর। পা আর চলতে চাইছিলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ। সহসঙ্গীরা কেউ কাছেপিঠে নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে সন্দীপকে। দ্রুত উঠে যাচ্ছে । কোনদিকে না তাকিয়ে। পেছনে অন্য কে যেন ছিলো। আস্তে আস্তে একসময় দেখলাম, সামনে আর উচু কিছু নেই। কয়েকধাপের সিঁড়ি উঠে গেছে সামিটের জায়গাতে। সিঁড়ির গোড়ায় লেখা, কেওক্রাডং। হঠাৎ সব আবেগের অবসান হলো। শরীর থেমে যাইতে চাইলো। তারপরও আস্তে আস্তে উঠে গেলাম উপরে। আহ! কেওক্রাডং সামিট! আবেগের আতিশয্য সময় দেখে রাখার কথা ভুলিয়ে দিলো। জিপিএস একুরেসি ঠিক করার চেষ্টা শেষ করে গা এলিয়ে বসে রইলাম সামিটে নির্মিত ছাউনিতে। অপেক্ষা করছিলাম বাকীদের উঠে আসার।

জুমের আগুনে বিকেল নামে নির্জন ট্রেইলে

আমরা তখন সবাই বসে দেখছি পাখির চোখে চারপাশ। সবকিছু ছাড়িয়ে উঠে গেছি আমরা। সুবিশাল উচ্চতায়। দূরের দিগন্তে আরো অনেক পাহাড় মাথা বের করে ছিলো মেঘের আবরণের ফাঁক গলে। এমন সময় দেখলাম নীচের পাহাড়ে হঠাৎ ধপ করে জ্বলে উঠলো আগুন। প্রথমে ভেবেছি, জুমের পরিকল্পিত আগুন। কিন্তু দেখতে দেখতে সে আগুন ছাড়িয়ে গেলো মাত্রা। তীব্র গ্রাসে এগিয়ে আসছে উপর দিকে। কেওক্রাডংয়ের সিঁড়ির কাছেই লারামদার কটেজ। সেখানেই আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। লারামদার কটেজের সবাই এবং আর্মি ক্যাম্পের সৈনিকরা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। লারামদারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলো পানি নিয়ে। প্রয়োজনে আগুন নিভাতে তৈরী। আর্মিরা বলছিলো, পাহাড়িদের ইচ্ছাকৃত লাগানো এই আগুন। জুমচাষ করতে না দেয়ার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। নিউটনের চোখে নীরব স্বীকৃতি..। আমি জানি না জুমচাষ কতোটুকু ভালো কিংবা কতোটুকু খারাপ। তবে, আমার মনে হয়, পাহাড় যাদের ঘরবাড়ি, বেঁচে থাকার জায়গা, তারাই ভালো বুঝবে পাহাড়ের কিসে ভালো কিসে মন্দ। পাহাড়ের মানুষেরা এই ইকোসিস্টেমের অংশ। তারা জানে, কীভাবে পাহাড়কে অবলম্বন করে বাঁচতে হয়..। জানে বলেই এই দুর্গম পর্বতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম টিকে আছে। আমরা যখন ফিরছি কেওক্রাডং থেকে, তখন বিকেল নামছে ধীর পায়েতে। নির্জন ট্রেইলে আমাদের শব্দশুধু..। পোড়া পাহাড়, গয়ালের ঘাস খাওয়া, কাঠবেড়ালির উঁকিঝুকি, পোকাদের তীক্ষ্ণ রব সঙ্গী করে আমরা ফিরছি বগাকাইনে..।

জলপাই রংয়ের তীব্র ঝাঁজ ও আমাদের পূর্ণিমাযাপন

সামিট শেষ করে আমরা আবার ফিরছি বগালেগে। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা হলো আমাদের ফিরতে। বগাকাইনের ঠান্ডাজ্বলে সবাই মিলে ভরপুর গোসল করলাম। তারপর খেয়ে-দেয়ে সিয়ামদির কটেজের বারান্দায় আবার আমরা বসলাম আড্ডা দিতে। বগাকাইনের শেষ রাত আমাদের। জ্যোৎস্নার রুপোলি আলো ঝরে ঝরে পড়ছে বগামুখ পাড়ার আঙিনা জুড়ে। কী দারুন রাত!

একটু পর রোজকার মতো টহলদার সৈনিকের হাকডাক শোনা গেলো। দেখলাম, বেশ কয়েকজন সৈনিক আসলো। হাতে বড়ো বাঁশের টুকরো। জলপাই রংয়ের ইউনিফর্মে পূর্ণিমার আলো মিলেমিশে অদ্ভূত রং তৈরী করেছে। আমাদের পাশে অন্য আরেকটি গ্রুপ গিটার বাজিয়ে গান করছিলো। ওরা সবাই শেষ বিকেলে মোটরসাইকেলে বান্দরবান থেকে বগামুখপাড়ায় পৌঁছেছে। আর্মিদের আপত্তি থাকলেও পরে আবার অনুমতি দেয়ায় ওরা এখানে রাতের জন্য থাকছে। হঠাৎ শুরু হলো ওদের উপর আর্মির লাঠিচার্জ। অমানুষিক আক্রোশে লাঠিগুলো ঝাপিয়ে পড়ছিলো ছেলেগুলোর উপর। লাঠির উঠানামা জ্যোৎস্নালোকিত আঙিনায় বিভ্রান্তিকর লাগছিলো। চিৎকার, কান্না, আকুতির আওয়াজ রাতের তক্ষকের ডাকের সাথে মিলে যাচ্ছিলো। আমরা সবাই সেঁটে ছিলাম যার যার চেয়ারে। আমার অনুভূতিও বোধহয় ক্ষণিকের জন্য অবসরে গিয়েছিলো।

হঠাৎ আমাদের জটলাটির দিকে এগিয়ে এসে একজন সৈনিক হাঁক ছাড়লো, এই! কতোবড়ো সাহস! এখনো বসে আছিস! জোড় শক্তিতে একটা চেয়ারের পায়াতে আঘাত করলো তার লাঠি। আমরা সবাই ছুটে ওঠলাম। নিজেদের মাচাংয়ের ঘরের আশ্রয়ে যাচ্ছি..।

ছেলেগুলোর গানের সুর তখনও আমার কানে বাজেছিলো। কফি হাউজের আড্ডা থাকুক কিংবা না থাকুক, এই রাতের কথা ওরা কোনদিনও ভুলবে না। পরদিন সকালে আমরা ফেরার সময় আমাদের জানানো হয়েছিলো, ওরা নির্দোষ ছিলো! উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে এসে পড়েছে! দোষী কিংবা নির্দোষ, সে বিচারে আমি যাচ্ছি না। তবে, মনে হয়েছে, এভাবে বিনা নোটিশে অমানুষিক তীব্রতায় কাউকে মারার ব্যাপারটি কখনোই কাম্য নয়, উচিত নয় এবং অবিচারও বলা চলে। জলপাই রঙের কড়া ঝাঁজ সেদিনের রাতটির পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছিলো।

ফেরতযাত্রায় শহুরে সৌখিন পর্বতারোহী

রাতেই ঠিক করে ফেলেছিলাম, আমরা সকাল হতেই ফিরবো শহরে। ভোরে ঘুম ভেঙে যেতেই বের হয়ে পড়ার তোড়জোর শুরু হলো আমাদের। তৈরী হয়ে নিয়ে বগামুখপাড়াকে পেছনে রেখে আমাদের পথ চলা শুরু হলো।

আর্মি ক্যাম্পে আবার হাজিরা শেষ করে পাহাড়ের মাথা থেকে শেষ বারের মতো দেখে নিলাম বগাকাইন হ্রদ। শহুরে সৌখিন পর্বতারোহী আমরা এবার ফিরছি ঘিঞ্জি শহরে আমাদের খোয়াড়ে। বার বার মনে মনে বলছিলাম, আবার ফিরবো সুপ্রিয় বগাকাইন! কোন এক বর্ষায় ঝুম বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে আবার আসবো আমি। ভালো থেকো তুমি..। ভালো থেকো সিয়ামদি, লারামদা, হাসিখুশি মুখের নিউটনদা..। ভালো থেকো প্রিয় নির্জন ট্রেইল..।

কেওক্রাডং ম্যাপ

গুগল টপোগ্রাফিক ম্যাপ

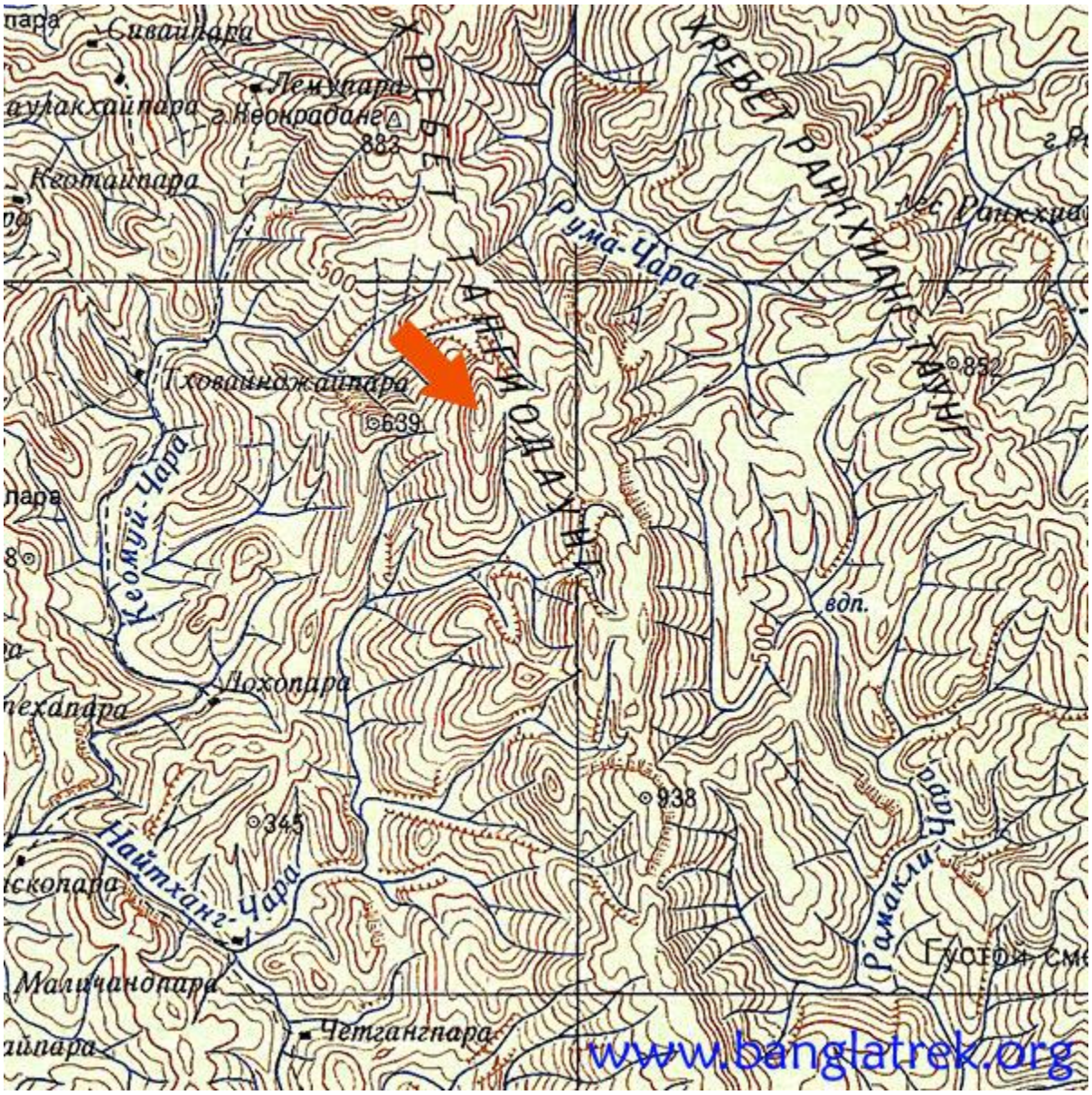

রাশিয়ান টপোগ্রাফিক ম্যাপ

সিআইএ টপোগ্রাফিক ম্যাপ

খরচের বিস্তারিত

এই ট্রিপে খরচের বিস্তারিত হিসাব এখনো করে উঠতে পারি নি। তাই , সবিস্তারে সে হিসাব দিচ্ছি না আপাতত। পরে কখনো সুযোগমতো আপডেট করে দেয়া হবে।

টিম মেম্বার ও তাদের দায়িত্ব

ক্রমিক	নাম	দায়িত্ব
০১	সালেহীন আরশাদী	টিম লিডার
০২	রাকিবুল ইসলাম	ম্যানেজার
০৩	নীরব মাহমুদ	জিপিএস ট্র্যাকিং
০৪	খন্দকার ইশতিয়াক মাহমুদ	ভিডিওগ্রাফার
০৫	তাহমিনা সুলতানা ছন্দা	ডকুমেন্টেশন সহকারী
০৬	ফারহীন মাশফিকা মালেক	ডকুমেন্টেশন সহকারী
০৭	মাজহারুল ইসলাম বাবু	ডকুমেন্টেশন সহকারী
০৮	মোহাম্মাদ জাহিরুল ইসলাম	ডকুমেন্টেশন সহকারী
০৯	মাজহারুল ইসলাম মুছা	ডকুমেন্টেশন সহকারী
১০	তানজিল শাহরিন	ডকুমেন্টেশন সহকারী
১১	অপূর্ব দীপ্ত দাস	ডকুমেন্টেশন সহকারী
১২	সন্দীপ রায়	এ্যাকশন ক্যামগ্রাফার

এক্সপিডিশনের ছবিলগ

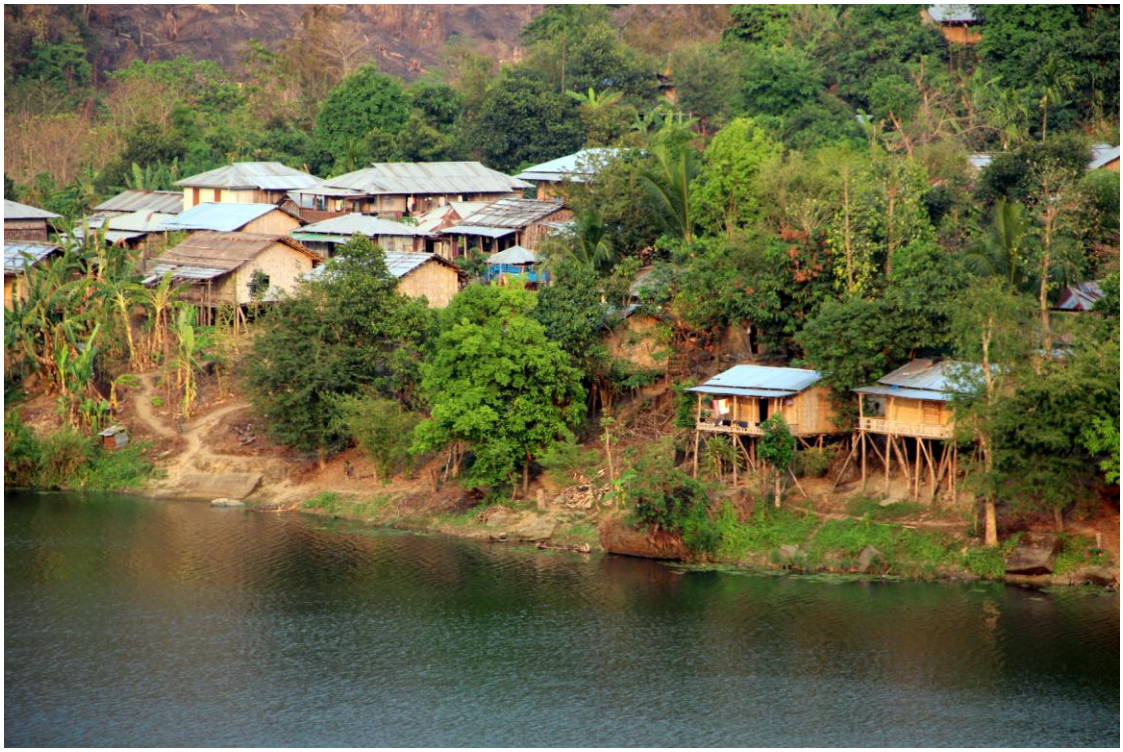

ALLERGIC TO
STUPID
PEOPLE.
1971

পরিশিষ্ট

এটা আমার প্রথম ট্রেকিং ট্রিপ ছিলো। তথ্যসংগ্রহ একটা পার্ট ছিলো আমাদের। কিন্তু, নতুন হওয়াতে পাহাড়ি পরিবেশ আমাকে তথ্য সংগ্রহে খুব একটা সফলতা দেয় নি। তাই, পথের বিভিন্ন পাড়া, ঝিরি, চূড়ার নাম সংগ্রহে রাখতে পারি নি। এই এক্সপিডিশন/ট্রিপে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছে, শুভ কামনা জানিয়েছে, সবার কাছে কৃতজ্ঞতা। টিওবি কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা টিম লিডার সালেহীন আরশাদী ভাইকে, লিড করার জন্য। খুব সংক্ষিপ্ত আকারে কৃতজ্ঞতা লিষ্ট তুলে দিলাম।

ক্রমিক	বিষয়	নাম
০১	ছবি কৃতজ্ঞতা	খন্দকার ইশতিয়াক মাহমুদ
০২	” ”	মাজহারুল ইসলাম মুছা
০৩	জিপিএস ডিভাইস কৃতজ্ঞতা	সালেহীন আরশাদী
০৪	ম্যাপ ও তথ্য কৃতজ্ঞতা	বাংলাট্রেক
০৫	সামিট রিপোর্ট তৈরী সহযোগীতা	সালেহীন আরশাদী